بسم اللہ الرحمن الرحیم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৪ আগস্ট, ২০২০ মোতাবেক ১৪ যহুর, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেনঃ

গত দু' সপ্তাহ পূর্বের জুমুআয় সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর স্মৃতিচারণ হচ্ছিল, আজও তার সম্পর্কেই কিছু কথা বলব। যুদ্ধের কথা হচ্ছিল, যুদ্ধের সময় হযরত সা'দ (রা.)-এর স্ত্রী হযরত সালমা বিনতে হাফসা (রা.) দেখেন, শিকলাবদ্ধ একজন বন্দি অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণে আকাঙ্ক্ষী ছিল, তার নাম ছিল আবু মেহজান সাক্ফী। হযরত উমর (রা.) তাকে মদ পানের অপরাধে দেশান্তরের শাস্তি দিয়েছিলেন। সে এখানে আসে আর এখানে আসার পর সে পুনরায় মদ পান করে, যে কারণে হযরত সা'দ (রা.) তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেন এবং (পায়ে) শিকল পরিয়ে দেন। আবু মেহজান হযরত সা'দ (রা.)-এর ক্রীতদাসী যাহরা-কে অনুরোধ করে যে, আমার শিকল খুলে দাও যাতে আমি যুদ্ধে যোগ দিতে পারি। সে আরো বলে, আল্লাহ্র কসম! আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে ফিরে এসে নিজেই শিকল পরে নিব। দাসী তার কথা মেনে নেয় এবং শিকল খুলে দেয়। আবু মেহজান হযরত সা'দ (রা.)-এর ঘোড়ায় আরোহন করে যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করে এবং শত্রু সারিতে ঢুকে পড়ে আর সোজা গিয়ে বড় শ্বেত হস্তির ওপর হামলা করে। হযরত সা'দ (রা.) এসবই প্রত্যক্ষ করছিলেন, তিনি বলেন, ঘোড়াটি তো আমার, কিন্তু এর ওপর আরোহী আবু মেহজান সাক্ফী মনে হচ্ছে। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল, অসুস্থতার কারণে হযরত সা'দ (রা.) সরাসরি এই যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি (কিন্তু) দূর থেকে নিগরানী বা তত্ত্বাবধান করছিলেন। যাহোক, তিনদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে, যুদ্ধ শেষ হলে আবু মেহজান সাকফী ফিরে এসে নিজের শিকল পরে নেয়। হযরত সা'দ (রা.) আবু মেহজানকে একথা বলে মুক্ত করে দেন যে, তুমি যদি ভবিষ্যতে আবার মদ পান কর তাহলে আমি তোমাকে কঠোর শাস্তি দিব। আবু মেহজান অঙ্গীকার করে যে, ভবিষ্যতে কখনো মদ পান করবে না। অপর এক স্থানে বর্ণিত আছে যে, হযরত সা'দ (রা.) এই ঘটনা হযরত উমর (রা.)-কে লিখলে তিনি বলেন, সে যদি ভবিষ্যতে মদ পান করা থেকে তওবা করে তাহলে তাকে শাস্তি দিও না। এ কারণে আবু মেহজান ভবিষ্যতে আর মদ পান না করার কসম খায় এবং হযরত সা'দ (রা.) তাকে মুক্ত করে দেন।

এই ঘটনার বিস্তারিত হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্বে বলা হয়েছিল, দাসী তাকে ছেড়ে দেয়, কিন্তু তিনি (রা.) এভাবে লিখেছেন যে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) মহানবী (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবীদের একজন ছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাকে নিজ খিলাফতকালে ইরানী বাহিনীর মোকাবিলায় ইসলামী বাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত করেছিলেন। দৈবক্রমে তার উরুতে একটি ফোঁড়া বের হয় যাকে বাগি বলা হয়, তা দীর্ঘদিন ভোগাতে থাকে। বহু চিকিৎসা করিয়েও কোন লাভ হয়নি। অবশেষে তিনি ভাবলেন, আমি যদি বিছানায় পড়ে থাকি আর সৈনিকরা দেখে যে, আমি সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে নেই, তাহলে তারা মনোবল হারিয়ে বসবে। কাজেই, তিনি একটি গাছের ওপর মাচা প্রস্তুত করান, যেমনটি আমাদের এখানে মানুষ বাগান পাহারা দেওয়ার জন্য বানিয়ে থাকে। তিনি লোকদের সাহায্যে নিয়ে সেই মাচায় চড়ে বসতেন যাতে মুসলমান বাহিনী তাকে দেখতে পায় আর তারা আশ্বস্ত হয় যে, তাদের কমাণ্ডার সাথেই আছেন। সে দিনগুলোতেই তিনি (রা.)

সংবাদ পান যে, একজন আরব নেতা মদ পান করেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, যদিও ইসলামে মদ হারাম ছিল কিন্তু আরবরা এতে গভীরভাবে আসক্ত ছিল; আর একবার নেশায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা ছাড়াতে অনেক কষ্ট হয়। সেই নেতারও ইসলাম গ্রহণের পর মাত্র দু'তিন বছরই অতিবাহিত হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, কারো যদি নেশার পুরোনো অভ্যাস থাকে তাহলে দু'তিন বছরে সেই বদভ্যাস দূর হয় না। যাহোক হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) যখন এই মুসলিম আরব নেতার মদ পান সম্পর্কে অবগত হন তখন তিনি তাকে বন্দি করেন। সে সময় রীতিমতো জেলখানা ছিল না, কাউকে বন্দি বানাতে হলে তাকে কোন কক্ষে আটকে রাখা হতো এবং দরজায় পাহারাদার নিযুক্ত করা হতো। সুতরাং, এই মুসলিম আরব নেতাকেও একটি কক্ষে বন্দি করে দরজায় পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়। এরপর তিনি লিখেন, এই যুদ্ধ যখন সংঘটিত হচ্ছিল সে বছরটিকে ইসলামের ইতিহাসে বিপদের বছর বলে আখ্যায়িত করা হয়, কেননা এই যুদ্ধে মুসলমানদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এক জায়গায় ইসলামী সেনাবাহিনীর ঘোড়াগুলো শত্রুদের হাতি দেখে পলায়ন করে; এর পাশেই একটি ছোট নদী ছিল, ঘোড়াগুলো সেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আরবরা যেহেতু সাঁতার কাটতে জানত না, তাই শত শত মুসলমান পানিতে ডুবে মারা যায়। এজন্য এ বছরটিকে বিপদের বা সংকটের বছর বলা হয়। যাহোক, সেই মুসলিম আরব নেতা এক কক্ষে বন্দি ছিল, মুসলমান সৈনিকরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সেই কক্ষের নিকটে বসে আলোচনা করত যে, এ যুদ্ধে মুসলমানদের খুবই ক্ষতি সাধিত হয়েছে। সে তখন মর্মপীড়ায় ভুগতো আর আক্ষেপ করত যে, এমন সময়ে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে নি। নিঃসন্দেহে তার মাঝে এই দুর্বলতা ছিল যে, সে মদ পান করেছে, কিন্তু সে বড়ই সাহসী মানুষ ছিল আর তার মাঝে এক উদ্দীপনা ছিল। যুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা শুনে কক্ষের ভেতরে সে এমনভাবে পায়চারি করতো যেভাবে খাঁচার বাঘ পায়চারী করে বেড়ায়। পায়চারী করা অবস্থায় সে যে পঙক্তি আওড়াতো তার অর্থ হলো, আজই ইসলামকে রক্ষা করার এবং নিজ বীরত্বের স্বাক্ষর রাখার সুবর্ণ সুযোগ তোমার ছিল, কিন্তু তুমি কারারুদ্ধ। হযরত সা'দ (রা.)-এর স্ত্রী খুবই সাহসী মহিলা ছিলেন। একদিন তিনি সেই কক্ষের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এই পঙক্তি শুনতে পান। তিনি দেখেন যে, দরজায় পাহারাদার নেই। তিনি দরজার কাছে গিয়ে সেই বন্দিকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি জান যে, সা'দ তোমাকে বন্দি করে রেখেছে। তিনি যদি জানতে পারেন যে, আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি তাহলে তিনি আমাকে ছাড়বেন না। কিন্তু আমার মন তোমাকে মুক্ত করে দিতে চায় যেন তুমি নিজের বাসনানুযায়ী ইসলামের কাজে আসতে পার। সে বলে, যুদ্ধের সময় আপনি আমাকে মুক্ত করে দিন, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যুদ্ধ শেষে দ্রুত ফিরে এসে এই কক্ষে ঢুকে পড়ব। উক্ত মহিলার হৃদয়েও ইসলামের জন্য মর্মব্যথা ছিল এবং ইসলামের সুরক্ষার জন্য এক বিশেষ উদ্দীপনা ছিল। তাই তিনি উক্ত ব্যক্তিকে বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে দেন। অতঃপর সে যুদ্ধে যোগদান করে আর এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যে, তার এই বীরত্বের কারণে ইসলামী সেনাবাহিনী পিছপা হওয়ার পরিবর্তে সামনে অগ্রসর হয়। সা'দ (রা.) তাকে চিনে ফেলেন এবং পরবর্তীতে বলেন, আজকের যুদ্ধে সেই ব্যক্তি ছিল যাকে আমি মদ পানের অপরাধে বন্দি করে রেখেছিলাম। সে যদিও চেহারায় নেকাব পরে রেখেছিল কিন্তু আমি তার আক্রমণের ধরন ও তার উচ্চতা জানি। যে ব্যক্তি একে মুক্ত করেছে আমি তাকে খুঁজে বের করব এবং কঠোর শাস্তি দিব। অর্থাৎ, যে এই ব্যক্তিকে বন্দিশালা থেকে মুক্ত করেছে, এর শৃঙ্খল খুলে দিয়েছে, তাকে কঠোর শাস্তি দিব। হযরত সা'দ (রা.) যখন একথা বলেন তখন তার স্ত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তোমার কি লজ্জা হয় না? নিজে গাছে মাচা বানিয়ে বসে আছ আর এমন ব্যক্তিকে বন্দি করে রেখেছ যে কিনা নিঃশঙ্কচিত্তে শত্রুবুহ্য ভেদ করে ঢুকে পড়ে আর নিজ প্রাণেরও কোন পরোয়া করে না। সেই বক্তিকে বন্দিদশা থেকে আমি

মুক্ত করেছি, তোমার যা ইচ্ছে কর। আমিই তাকে মুক্ত করেছিলাম, এখন তোমার যা ইচ্ছা করতে পার।

যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিবরণ লাজনাদের উদ্দেশ্যে তাঁর এক বক্তৃতায় তুলে ধরেছিলেন আর বলেছিলেন, নারীরা ইসলামের জন্য অনেক বড় বড় কাজ করেছে। তিনি বলেন, অতএব, আজও আহমদী নারীদের এসব দৃষ্টান্তকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। অতঃপর তিনি হযরত যায়েদ (রা.)-এর বরাতেই নারীদের ত্যাগ-তিতিক্ষার আরো ঘটনা শুনান। আনসারদের বনু সুলায়েম গোত্রের বিখ্যাত মহিলা কবি ও মহিলা সাহাবী হযরত খানসা (রা.) এ যুদ্ধে তার ৪ পুত্রকে আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করেন। হযরত খানসা (রা.)-এর স্বামী এবং ভাই তার যৌবনকালেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি (রা.) খুব কষ্ট করে তার সন্তানদের লালন পালন করেছিলেন। কাদসিয়া যুদ্ধের শেষ দিন প্রভাতে যুদ্ধের পূর্বে হযরত খানসা (রা.) তার পুত্রদের সম্বধোন করে বলেন, হে আমার পুত্ররা! তোমরা নিজ ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং স্বেচ্ছায় হিজরত করেছ। সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, আমি তোমাদের বংশকে কখনো লজ্জিত হতে দেই নি। স্মরণ রেখো! পারলৌকিক জীবন এই নশ্বর জীবন অপেক্ষা অনেক উত্তম। হে আমার পুত্ররা! দৃঢ়চিত্ত ও অবিচল থেকো আর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ কোরো। খোদার তাকওয়া অবলম্বন কর। যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় আর অশ্বারোহীরা বুক ফুলিয়ে যুদ্ধ করে, তখন তোমরা নিজেদের পরকালকে সুনিশ্চিত করার জন্য তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ো। হযরত খানসা (রা.)-এর পুত্ররা তার নির্দেশ পালন করে নিজেদের ঘোড়ার লাগাম ধরে রণ-সংগীত গাইতে গাইতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করে। সেদিন সন্ধ্যা নামার পূর্বেই কাদসিয়ার বুকে ইসলামী পতাকা উড়তে থাকে। হযরত খানসা (রা.)-কে যখন বলা হয়, আপনার চার পুত্রই শহীদ হয়েছে তখন তিনি (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ যে, তিনি তাদেরকে শাহাদাতের সম্মানে ভূষিত করেছেন। এটি আমার জন্য কম গর্বের বিষয় নয় যে, তারা সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। আমি আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই আমাদেরকে স্বীয় রহমতের ছায়ায় একত্রিত রাখবেন।

কাদসিয়া বিজয়ের পর ইসলামী বাহিনী বেবিলন বিজয় করে। বেবিলন ছিল বর্তমান ইরাকের প্রাচীন শহর। পবিত্র কুরআনেও হারুত ও মারুতের বরাতে এর উল্লেখ হয়েছে। এটি সেখানেই ছিল যেখানে বর্তমান কূফা অবস্থিত। শহর পরিচিতি (পুস্তকে) এর এই পরিচিতিই লিখা রয়েছে। অতঃপর তিনি (রা.) আরো লিখেন, এটি জয় করার পর (ইসলামী সেনাদল) কুসা নামক ঐতিহাসিক শহরে পৌঁছে। এটি হলো সেই স্থান যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে নমরুদ (বাদশাহ্) বন্দি করেছিল। তখনও সেই বন্দিশালা বিদ্যমান ছিল। হযরত সা'দ (রা.) সেখানে পৌঁছার পর সেই বন্দিশালা দেখে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পাঠ করেন– تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ (সূরা আলে ইমরান: ১৪১) অর্থাৎ এ দিনগুলো এমন যে, আমরা সেগুলো মানুষের মাঝে আবর্তিত করে থাকি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কুসা থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে তারা 'বাহরাসীর' নামক এক স্থানে পৌঁছেন। মু'জেমুল বুলদান অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের শহর পরিচিতি পুস্তকে এর নাম 'বাহোরে সীর' উল্লেখ রয়েছে। 'বাহোরে সীর' দজলা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত ইরাকের শহর মিদিয়ান-এর কাছে বাগদাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর একটি স্থানের নাম। এখানে কিসরার বাদশাহ্‌র শিকারী বাঘ থাকত। হযরত সা'দ (রা.)-এর সেনাদল এর কাছাকাছি পৌঁছলে তারা সেই হিংস্র জন্তুকে এই সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণের জন্য ছেড়ে দেয় আর বাঘ গর্জে উঠে সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ করে। হযরত সা'দ (রা.)-এর ভাই হযরত হাসেম বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) সেনাদলের অগ্রসারির কমাণ্ডার ছিলেন। তিনি সেই বাঘের ওপর তরবারি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করেন যে, বাঘ সেখানেই কুপোকাত হয়ে যায়।

এরপর এই একই যুদ্ধাভিযানে মিদিয়ানের যুদ্ধও রয়েছে। মিদিয়ান কিসরার রাজধানী ছিল। এখানে তাদের শুভ্র প্রাসাদগুলো বিদ্যমান ছিল। মুসলমান ও মিদিয়ানের মাঝে দজলা নদী প্রতিবন্ধক ছিল। ইরানীরা নদীর ওপর থাকা সব পুল ভেঙে ফেলে। হযরত সা'দ (রা.) সেনাদলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মুসলমানরা! শত্রুরা নদীর আশ্রয় গ্রহণ করেছে, চল! আমরা এটি সাঁতরে পার হই। একথা বলেই তিনি অর্থাৎ হযরত সাদ (রা.) তার ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেন আর সৈন্যরা তাদের অধিনায়কের অনুসরণে তাদের ঘোড়া নিয়ে নদীতে নেমে পড়ে। এভাবে ইসলামী সেনাদল নদী পার হয়ে যায়। ইরানীরা বিস্ময়কর এই দৃশ্য দেখে ভীতত্রস্ত হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করে দৈত্য এসেছে, দানব এসে গেছে বলতে বলতে পলায়ন করে। মুসলমানরা সম্মুখে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে শহর ও কিসরার প্রাসাদগুলো দখল করে নেয় আর এভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় যা তিনি (সা.) পরিখার যুদ্ধের সময় পরিখা খননকালে পাথরে কোদাল দিয়ে আঘাত হানার সময় বলেছিলেন যে, আমাকে মিদিয়ানের শুভ্র প্রাসাদগুলো পতনের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। সেই প্রাসাদগুলো জনমানবহীন অবস্থায় দেখে হযরত সা'দ (রা.) সূরা দুখানের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন:

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (সূরা দুখান: ২৬-২৯)

অর্থাৎ, কতই না বাগান ও ঝর্ণা (তারা) পশ্চাতে ছেড়ে গেছে, এবং শস্যক্ষেত ও সুন্দর-মনোরম আবাসস্থল, আর নেয়ামত, যাতে তারা পরম সুখ ও আনন্দে বসবাস করত। এমনই (হয়েছিল) এবং আমরা অন্য এক জাতিকে সেসবের উত্তরাধিকারী করে দিলাম। (সূরা দুখান: ২৬-২৯)

যাহোক, এরপর হযরত সা'দ (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে পত্র মারফত আরো অগ্রসর হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রত্যুত্তরে হযরত উমর (রা.) জানান যে, আপাতত অগ্রাভিযানের সেখানেই ইতি টানুন এবং বিজিত এলাকার আইন-শৃঙ্খলার প্রতি মনোযোগী হোন। তদনুযায়ী হযরত সা'দ (রা.) মিদিয়ানকে কেন্দ্র বা রাজধানী বানিয়ে আইন-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল করতে সচেষ্ট হন এবং তা সুচারুরূপে সম্পাদন করতে সক্ষমও হন। তিনি ইরাক অঞ্চলের আদমশুমারি করান ও পুরো অঞ্চল পরিমাপ করান আর প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত করেন এবং নিজের সুপরিকল্পনা ও উত্তম কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে রণকৌশলে পারদর্শিতার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার যোগ্যতাও দান করেছেন। মানুষের ধারণা হলো, মুসলমানরা যখন কোন অঞ্চল জয় করেছে তখন হয়ত প্রজাদের প্রতি দেখাশুনা করেনি। অথচ (প্রকৃত চিত্র হলো) মুসলমানরা যখনই কোন শহর জয় করেছে, স্থানীয়দের পূর্বের তুলনায় অধিক যত্ন নিয়েছে।

এরপর রয়েছে কূফা নির্মাণের বিষয়টি। মিদিয়ানের আবহাওয়া আরবের স্বাস্থ্যসম্মত ছিল না। তাই হযরত সা'দ (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর অনুমতি নিয়ে এক নতুন শহর গড়ে তোলেন, যেখানে বিভিন্ন আরব গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করান, যেখানে একযোগে চল্লিশ হাজার মুসুল্লী নামায আদায় করতে পারতো। কূফা ছিল মূলত সেনানিবাস– যেখানে এক লক্ষ সৈনিক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত সা'দ এক দীর্ঘকাল মিদিয়ানে অবস্থানের পর অনুভব করেন যে, এখানকার আবহাওয়া আরবদের রং-রূপ একেবারেই বদলে দিয়েছে। হযরত উমর (রা.)-কে এ বিষয়ে জানানো হলে তাঁর পক্ষ থেকে আদেশ আসে যে, আরব সীমান্তে কোন যথোপযুক্ত এলাকা অন্বেষণ করে এক নতুন শহর আবাদ করুন এবং সেখানে আরবদেরকে আবাদ করে সেটিকেই কেন্দ্র বা রাজধানী ঘোষণা দিন। হযরত সা'দ উক্ত আদেশ অনুযায়ী মিদিয়ান থেকে বের হয়ে একটি অতি উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে কূফা

নামে এক বৃহৎ শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি আরবের ভিন্ন ভিন্ন গোত্রগুলোর পৃথক পৃথক পাড়ায় আবাসনের ব্যবস্থা করেন। শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে বিশাল মসজিদ নির্মাণ করান, যেখানে প্রায় চল্লিশ হাজার নামাযীর সংকুলান হতো। মসজিদের সন্নিকটেই বায়তুল মালের ভবন এবং নিজের বসবাসের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করান– যেটি কাসরে সা'দ তথা সা'দের প্রাসাদ বলে সুখ্যাত ছিল। এর পরের বিষয়টি হলো, নাহাবন্দ-এর যুদ্ধ। এখানে একবিংশ হিজরীতে ইরানীরা ইরাকে আজাম তথা ইরাকের সেই অংশ যেটি পারস্যবাসীদের অধীনস্থ ছিল, সেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে নাহাবন্দ নামক জায়গায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইরানী দেড় লক্ষ পুরোদস্তুর যোদ্ধা একত্রিত হয়। হযরত সা'দ (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে এ বিষয়ে অবগত করলে হযরত উমর (রা.) অভিজ্ঞ পরামর্শকদের পরামর্শক্রমে ইরাকী বংশোদ্ভূত হযরত নু'মান বিন মুকাররিন মুযনীকে মুসলিম যোদ্ধাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। হযরত নু'মান তখন কাসকারে অবস্থান করছিলেন। কাসকার নাহরাওয়ান থেকে শুরু করে বসরার নিকটবর্তী দজলা নদীর উৎসস্থলে ডান পাশের এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে বহু গ্রাম ও শহর রয়েছে। মোটকথা, হযরত উমর (রা.) তাকে নাহাবন্দ পৌঁছার নির্দেশ দেন। দেড় লক্ষ ইরানীদের মোকাবিলায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশ হাজার। হযরত নু'মান সেনাসারিতে ঘুরে ঘুরে তাদেরকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং বলেন, আমি যদি শাহাদাত বরণ করি তাহলে সেনাদলের প্রধান বা সেনাপতি হবেন হুযায়ফা। আর হুযায়ফাও যদি শাহাদাত বরণ করেন তাহলে অমুক সেনাপতি হবে, আর এভাবে এক এক করে তিনি সাত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন। এরপর দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তোমার ধর্মকে সম্মানিত কর এবং তোমার বান্দাদের সাহায্য কর আর নু'মান-কে আজ সর্বপ্রথম শাহাদাতের মর্যাদা দান কর। অপর এক বর্ণনা অনুসারে তিনি (রা.) এভাবে দোয়া করেন যে, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এ দোয়া করছি যে, আজ তুমি আমার চোখকে এমন বিজয়ের মাধ্যমে প্রশান্ত কর যাতে থাকবে ইসলামের সম্মান আর আমি লাভ করব শাহাদাত। যুদ্ধ আরম্ভ হলে মুসলমানরা এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যে, সূর্যাস্তের পূর্বেই রণক্ষেত্র মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং সেই যুদ্ধেই হযরত নু'মান (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। আবু লু লু ফিরোজ এ যুদ্ধে বন্দি হয় এবং সে দাস হিসেবে হযরত মুগীরা বিন শো'বার অধীনে আসে। এ হলো সেই ব্যক্তি যে পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.)-এর ওপর হামলা করে তাঁকে শহীদ করেছিল। হযরত উমর (রা.) নাহাবন্দের আমীরকে পত্র লিখেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যদি মুসলমানদের বিজয় দান করেন তাহলে খুমস অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশ গনিমতের সম্পদ বায়তুল মালে রেখে বাকি পুরোটাই মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করে দিবেন আর এই সেনাবাহিনী যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে কোন ভয় নেই, কেননা ভূপৃষ্ঠের চেয়ে এর পেট বা কবর উত্তম।

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে একবার বনু আসাদ গোত্রের লোকেরা হযরত সা'দ (রা.)-এর নামায পড়ানো নিয়ে আপত্তি করে এবং তারা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে অভিযোগ করে যে, তিনি (রা.) সঠিক পদ্ধতিতে নামায পড়ান না। হযরত উমর (রা.) এটি তদন্তের জন্য হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে প্রেরণ করেন। কিন্তু তদন্তে জানা যায় যে, অভিযোগটি ভুল ছিল। যাহোক, কতিপয় কারণবশত হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে মদিনায় ডেকে পাঠান। এর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে, তা হলো, হযরত জাবের বিন সামরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, কূফাবাসীরা হযরত উমর (রা.)-এর নিকট হযরত সা'দ (রা.)-এর নামে অভিযোগ করলে তিনি তাকে অপসারণ করেন এবং হযরত আম্মার (রা.)-কে আমেল তথা গভর্ণর নিযুক্ত করেন। কূফাবাসীরা হযরত সা'দ (রা.)-এর নামে দাখিলকৃত অভিযোগে এটিও বলেছিল যে, তিনি ভালোভাবে নামায পড়াতেন

না। হযরত উমর (রা.) তাকে ডেকে বলেন, হে আবু ইসহাক! (আবু ইসহাক হযরত সা'দের ডাকনাম ছিল) মানুষ বলে, আপনি নাকি ঠিকমতো নামাযও পড়ান না। উত্তরে আবু ইসহাক (রা.) বলেন, খোদার কসম! আমি তাদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর শেখানো নামায পড়াতাম আর এতে বিন্দুমাত্র কমবেশি করতাম না। এশার নামাযের প্রথম দুই রাকাত দীর্ঘ এবং পরবর্তী দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত করতাম। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আবু ইসহাক! আপনার বিষয়ে আমার এমনটিই ধারণা ছিল, অর্থাৎ আমার বিশ্বাস ছিল– আপনি এরূপই করেন। এরপর হযরত উমর (রা.) এক বা একাধিক মানুষকে তার বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য তার সাথে কূফায় প্রেরণ করেন। তারা হযরত সা'দ (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জন্য প্রতিটি মসজিদে যান এবং কোনটি বাদ দেন নি আর সর্বত্র মানুষ তার অর্থাৎ হযরত সাদ (রা.)-এর প্রশংসা করে। সবশেষে তারা বনূ আবাস গোত্রের মসজিদে যান। তাদের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যান, যাকে উসামা বিন কাতাদা বলা হতো এবং তার ডাকনাম ছিল আবু সা'দা। সে বলে, তুমি যেহেতু আমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়েছ তাই সত্য বলছি, প্রকৃত বিষয় হলো, সা'দ সেনাবাহিনীর সাথে যেত না, গনিমতের সম্পদ সমভাবে বণ্টন করত না এবং ন্যায়-মীমাংসা করত না। সে ব্যক্তি হযরত সা'দ (রা.)-এর উপর এই অভিযোগগুলো আরোপ করে। তখন অর্থাৎ একথা শুনে হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁর দরবারে তিনটি দোয়া করছি। হে আমার আল্লাহ্! তোমার এই বান্দা অর্থাৎ অভিযোগ উত্থাপনকারী যদি মিথ্যাবাদী হয় আর লোকদেখানো ও শস্তা খ্যাতির উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থাকে তবে তুমি তাকে দীর্ঘজীবি কোরো, তার দারিদ্রতা বৃদ্ধি কোরো এবং তাকে সমস্যায় জর্জরিত কোরো। এরপর যারাই তার অর্থাৎ সেই অপবাদ আরোপকারীর অবস্থা জানতে চাইত প্রত্যুত্তরে সে বলত, আমার বয়স হয়ে গেছে, বৃদ্ধ হয়ে গেছি, অবস্থা শোচনীয় এবং নানান সমস্যায় জর্জরিত আর আমার উপর হযরত সা'দ (রা.)-এর অভিশাপ লেগেছে অর্থাৎ আমি যে অপবাদ আরোপ করেছিলাম তার শাস্তি ভোগ করছি। আব্দুল মুলক বলতেন, এরপর আমি তাকে এরূপ অবস্থায় দেখেছি যে, বার্ধক্যের কারণে তার ভ্রুগুলো দু'চোখের ওপর এসে পেড়েছিল কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তা সত্ত্বেও তার চারিত্রিক অবস্থা এরূপ ছিল যে, সে রাস্তায় মেয়েদেরকে বিরক্ত করত, চোখ টিপত। বুখারীতে এসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

যাহোক, এসব অভিযোগ শুনে হযরত সা'দ খুব কষ্ট পান। তিনি বলেন, আরবদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র পথে তির নিক্ষেপ করেছে। আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে যখন যুদ্ধের জন্য বের হতাম তখন আমাদের কাছে গাছের পাতা ব্যতীত খাওয়ার কিছুই থাকত না। আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমাদের প্রত্যেকের মল উট বা ছাগলের শুকনো বিষ্ঠার ন্যায় হতো। পরিতাপ, আজ বনু আসাদ বিন খুযায়মা আমাকে ইসলামের নিয়ম-নীতি শেখায়! (এসব কথা যদি সত্য হয়) তবে তো আমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং আমার সব কর্ম বিফলে গেল। বনু আসাদের লোকেরা হযরত উমরের কাছে গীবত করেছিল এবং বলেছিল, সে ভালোভাবে নামায পড়ে না। এটিও বুখারীর বর্ণনা।

২৩ হিজরী সনে যখন হযরত উমরের ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয় তখন হযরত উমরের কাছে লোকজন নিবেদন করে যে, আপনি খিলাফতের জন্য কাউকে মনোনীত করুন। তখন হযরত উমর (রা.) খিলাফত নির্বাচনের জন্য একটি বোর্ড গঠন করেন যাতে হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম ও হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ (রা.) প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উমর বলেন, এদের মধ্য থেকে কাউকে নির্বাচিত করবে কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে জান্নাতবাসী আখ্যা দিয়েছেন। এরপর বলেন, যদি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস খিলাফত লাভ করেন তাহলে তিনিই খলীফা হবেন। নতুবা তোমাদের মধ্যে যে-ই খলীফা হন তিনি যেন

সা'দের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন, কেননা আমি তাকে এজন্য পদচ্যুত করি নি যে, তিনি কোন কাজ করতে অপারগ ছিলেন, আর এজন্যও নয় যে, তিনি কোন অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যখন হযরত উসমান (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন তখন তিনি হযরত সা'দকে পুনরায় কূফার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি তিন বছর এ দায়িত্বে বহাল থাকেন। এরপর কোন কারণে হযরত সা'দের হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদের সাথে বিরোধ হয়– যিনি তখন বাইতুল মালের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। যার কারণে হযরত উসমান তাকে পদচ্যুত করেন। হযরত সা'দ পদচ্যুত হবার পর মদিনায় নিভৃতে জীবনযাপন আরম্ভ করেন। যখন হযরত উসমানের বিরুদ্ধে নৈরাজ্য শুরু হয় তখনও তিনি নির্জনে থাকেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ফিতনার যুগে একবার হযরত সা'দের পুত্র হযরত সা'দকে প্রশ্ন করেন, আপনাকে কিসে জিহাদ করা থেকে বিরত রেখেছে? তখন হযরত সা'দ উত্তরে বলেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করব না যতক্ষণ না আমাকে এমন তরবারি এনে দাও যা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীকে সনাক্ত করতে পারে। এখন তো মুসলমানরা পরস্পর লড়াই করছে। অপর একটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ বলেছেন, এমন তরবারি আন যার চোখ, ঠোট ও জিহ্বা আছে, যে আমাকে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি বিশ্বাসী আর অমুক ব্যক্তি অবিশ্বাসী। এখন পর্যন্ত তো আমি কেবল অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছি।

সুনানে তিরমিযির একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ হযরত উসমানের যুগে উদ্ভব হওয়া নৈরাজ্য সম্পর্কে বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয় ভবিষ্যতে একটি ফিতনার উদ্ভব হবে। তখন বসে থাকা ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে আর দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে এবং চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে। অর্থাৎ কোনভাবেই ও কোনক্রমেই এ ফিতনার অংশ হবে না বরং আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে। তখন কেউ জিজ্ঞেস করেছিল যে, যদি নৈরাজ্য আমার ঘরে প্রবেশ করে তখন আমি কি করবো? যদি নৈরাজ্য আমার ঘরে প্রবেশ করে তাহলে আমি কী করব। তিনি বলেন, তাহলে তুমি আদম সন্তানের ন্যায় হয়ে যেও, অর্থাৎ যেমনটি পবিত্র কুরআনে ইবনে আদম এর উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ আত্মরক্ষা অবশ্যই কর, কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্যে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করবে না আর পবিত্র কুরআনে এ ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে এটিই বুঝা যায় যে, সম্ভবত এই উদাহরণই তিনি দিয়েছিলেন।

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন নৈরাজ্যের সূচনা হয় তখন এই নৈরাজ্যকে দূরীভূত করার ক্ষেত্রে সাহাবীদের চমৎকার ভূমিকার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যদিও সাহাবীদেরকে হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো না কিন্তু তারপরও তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তারা তাদের কাজ দুটি অংশে ভাগ করেন। যারা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন এবং যাদের চরিত্রের প্রভাব সাধারণের মাঝে বেশি তারা তাদের সময় লোকদেরকে বুঝানোর জন্য ব্যয় করতেন আর যারা তেমন কোন প্রভাব রাখতেন না অথবা যুবক ছিলেন তারা হযরত উসমান (রা.)-এর সুরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। পুনরায় তিনি লিখেন, প্রথমোক্ত জামা'তের মাঝে হযরত আলী এবং পারস্য বিজেতা হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস নৈরাজ্য দূর করার কাজে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর পর হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকালেও হযরত সা'দ নিভৃতেই ছিলেন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী যখন হযরত আলী এবং আমীর মুয়াবিয়ার মাঝে মতবিরোধ বৃদ্ধি পায় তখন আমীর মুয়াবিয়া তিনজন সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে তার সহযোগিতার জন্য চিঠি লিখেন এবং তাদেরকে লিখেন যে, তারা যেন হযরত

আলীর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করে। এতে তারা তিনজনই অস্বীকৃতি জানান। হযরত সা'দ আমীর মুয়াবিয়াকে এই পঙক্তিগুলো লিখে পাঠান,

মুয়াবিয়াতু দাউকা আদ্-দাউল আয়া'
ওয়া লায়সা লিমা তাজীউ বিহি দাওয়া'
আ ইয়াদউনী আবু হাসানিন আলীয়্যুন
ফালাম আরদুদ আলাইহে মা ইয়াশা'
ওয়া কুলতু লাহু আ'ত্বিনী সাইফান বাসীরান
তামিযু বিহিল আদাওয়াতু ওয়াল ওলা'
আ তাতমাউ ফিল্লাযী আ'ইয়া আলিয়্যান
আলা মা কাদ তামে'তা বিহিল আফা'
লেইয়াওমিম মিনহু খায়রুম মিনকা হাইয়ান
ওয়া মায়তান আনতা লিলমারয়ে ফিদাউহু

এর অনুবাদ হলো, হে মুয়াবিয়া! তুমি কঠিন রোগে ভুগছ, তোমার রোগের কোন ঔষধ নেই, তুমি কি এতটাও বুঝনা যে, আবু হাসান অর্থাৎ হযরত আলী আমাকে যুদ্ধ করার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু আমি তার কথাও মানিনি আর আমি তাকে বলেছি যে, আমাকে শত্রু ও বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য বলে দিতে পারে এমন তরবারি দান করুন। হে মুয়াবিয়া! তুমি কি আশা রাখ, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করার জন্য হযরত আলীর কথা রাখেনি সে তোমার কথা মেনে নিবে। অথচ হযরত আলীর জীবনের একটি দিন তোমার সারা জীবন ও মৃত্যুর চেয়েও উত্তম, আর তুমি এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাকে ডাকছ! উসদুল গাবাহ্-তে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার আমীর মুয়াবিয়া হযরত সা'দকে জিজ্ঞেস করেন, আবু তুরাবকে (আবু তুরাব হযরত আলীর ডাকনাম ছিল) মন্দ বলতে আপনাকে কোন জিনিস বারণ করে? তিনি তাকে মন্দ বলতেন না। হযরত সা'দ বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার সম্পর্কে যে তিনটি কথা বলেছিলেন, সেগুলোর কোন একটিও যদি আমার সম্পর্কে হতো, তবে তা আমার জন্য লাল উটের চেয়েও অধিক প্রিয় হতো। তিনটি কথার কারণে আমি কখনো তাকে অর্থাৎ হযরত আলীকে মন্দ বলব না। প্রথমত একবার রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আলীকে একটি যুদ্ধের সময় তাঁর (সা.) পিছনে রেখে যান। এতে হযরত আলী তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের মাঝে রেখে যাচ্ছেন? তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তুমি কি এতে আনন্দিত নও যে, আমার সাথে তোমার ঠিক সেরকমই সম্পর্ক, যেমনটি মূসার সাথে হারূনের সম্পর্ক ছিল; পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, আমার অবর্তমানে তুমি নবুয়্যতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নও। দ্বিতীয়ত খায়বারের যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার বলেন, আমি এমন ব্যক্তির হাতে ইসলামের পতাকা দেব, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা রাখে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলও তাকে ভালোবাসেন। এটি শুনে আমরা এর আকাঙ্ক্ষা করতে থাকি; প্রত্যেকের মাঝেই এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় যে, পতাকা যেন আমি পাই, আমিও আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসি! অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, আলীকে ডাক। তিনি আমাদের মধ্য থেকে কাউকেই তা দেন নি, বরং বলেন, আলীকে ডাক। হযরত আলী আসেন, তার চোখে যন্ত্রণা হচ্ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার চোখে নিজের মুখের পবিত্র লালা লাগিয়ে দেন এবং ইসলামের পতাকা তার হাতে তুলে দেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা সেদিন মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। তৃতীয় যে বিষয়টি তিনি বর্ণনা করেন তা হলো, যখন আয়াত فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ (সূরা আলে ইমরান: ৬২) যার অনুবাদ হলো তুমি বলে দাও– আস, আমরা আমাদের পুত্রদের ডাকি এবং তোমরা তোমাদের পুত্রদের ডাক, আমরা আমাদের নারীদের ডাকি এবং তোমরা তোমাদের নারীদের

ডাক– অবতীর্ণ হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনকে ডাকেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্! এরা হলো আমার পরিবার-পরিজন। এটি তিরমিযির রেওয়ায়েত।

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের পুত্র মুসআব বিন সা'দ বর্ণনা করেন, যখন আমার পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন তার মাথা আমার কোলে ছিল। আমার চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠে। তিনি আমাকে দেখে বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনার বিয়োগ ব্যাথা আর এ বেদনা যে, আপনার মৃত্যুর পর আপনার অনুরূপ কাউকে দেখছি না- এই দুঃখে কাঁদছি। তখন হযরত সা'দ বলেন, আমার জন্য কেঁদো না, আল্লাহ্ আমাকে কখনো শাস্তি দেবেন না, আর আমি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। কিছু লোক আপত্তি করে বসে যে, অমুক ব্যক্তি অমুক অনুষ্ঠানে বলেছে যে, অমুক জান্নাতী, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হয় কীভাবে? এখানে হযরত সা'দও বলছেন যে, আমি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর বলেন, আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে তাদের সেসব পুণ্যের প্রতিদান দিন যা তারা আল্লাহ্র জন্য করেন। আর কাফেরদের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে তা হলো– আল্লাহ্ তাদের ভালো কাজের কারণে তাদের শাস্তি লাঘব করে দেন; কিন্তু যখন সেসব ভালো কাজ ফুরিয়ে যায়, তখন পুনরায় তাদের শাস্তি দেন। প্রত্যেক মানুষের উচিত নিজের কর্মের প্রতিদান তাঁর কাছে চাওয়া, যাঁর জন্য সে সেই কর্ম করেছে। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর পুত্র বর্ণনা করেন, আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করি, আমি লক্ষ্য করেছি আপনি আনসারদের সাথে সে ব্যবহার করেন যা অন্যদের সাথে করেন না। তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি আনসাদের সাথে যে ব্যবহার করি তোমার মনে কি সে বিষয়ে কোন আপত্তি আছে? উত্তরে আমি বললাম, না; কিন্তু আপনার এই ব্যবহার দেখে আমি আশ্চর্য হই। হযরত সা'দ বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি, মু'মিনরাই তাদেরকে ভালোবাসে এবং মুনাফিকরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। সুতরাং, এ কারণেই আমি তাদের সাথে এমন ব্যবহার করি। জারীর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, একবার তিনি হযরত উমর (রা.)-এর কাছে যান। তিনি হযরত উমর (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত উমর (রা.) তাঁকে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমি তাঁকে (রা.) এমন অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি (রা.) তার রাষ্ট্রের সবচেয়ে ভদ্র মানুষ ও সবচেয়ে কম কঠোর। তিনি (রা.) তো তাদের জন্য মমতাময়ী মা তুল্য। পিপীলিকা যেভাবে সঞ্চয় করে তিনিও তাদের জন্য সেভাবে সঞ্চয় করেন। রণক্ষেত্রে তিনি সবার চেয়ে সাহসী, বীর এবং কুরাইশদের মাঝে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ৫৫ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তার (রা.) বয়স সত্তরের অধিক ছিল। মতান্তরে তার বয়স ছিল ৭৪ আবার কারো কারো মতে তার বয়স ছিল ৮৩। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর মৃত্যুর সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে তার (রা.) মৃত্যুর সন ৫১ হিজরী থেকে নিয়ে ৫৮ হিজরী পর্যন্ত পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনাকারী তার মৃত্যুর সন ৫৫ হিজরী উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুকালে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে তিনি (রা.) আড়াই লক্ষ দিরহাম রেখে যান। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) মদিনা থেকে সাত মাইল, মতান্তরে দশ মাইল দূরবর্তী এলাকা আক্বীক্ব নামক স্থানে মৃত্যু বরণ করেন। সেখান থেকে মানুষ কাঁধে করে তার শবদেহ মদিনায় নিয়ে আসে এবং মসজিদে নববীতে তার (রা.) জানাযা আদায় করা হয়। মদিনার তৎকালীন শাসক মারওয়ান বিন হাকাম তার জানাযা পড়ান। তার জানাযায় মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনীরাও অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হয়েছেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর জানাযা সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-

এর মৃত্যুর সময় মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীরা এই বার্তা পাঠান যে, মানুষ যেন তার জানাযা মসজিদে নিয়ে আসে যাতে তারাও জানাযার নামায পড়তে পারেন। তারা এমনটিই করে। জানাযা পড়ার জন্য তার মরদেহ তাদের ঘরের সামনে রাখা হয়েছিল। এরপর তার মরদেহ বসার স্থানসংলগ্ন বাবুল জানায়েয থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনীগণের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যে, মানুষ এটা নিয়ে সমালোচনা করছে আর বলছে যে, মরদেহ [মহানবী (সা.)-এর সময়] মসজিদে আনা হতো না। হযরত আয়েশা (রা.)-এর কানে এ কথা পৌঁছলে তিনি বলেন, মানুষ কত দ্রুত এমন বিষয় নিয়ে সমালোচনা আরম্ভ করে যা তারা জানেই না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, জানাযা মসজিদে প্রবেশ করানো হয়েছে বলে লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করে। অথচ মহানবী (সা.) মসজিদের ভিতরেই হযরত সুহায়েল বিন বায়যা (রা.)-এর জানাযার নামায পড়েছিলেন। এটি মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত।

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) মৃত্যুশয্যায় ওসীয়্যত করেন যে, আমার জন্য লেহেদ খনন কোরো আর মহানবী (সা.)-এর জন্য কবরে যেমন ইট লাগানো হয়েছিল আমার জন্যও তেমনটি কোরো। এটি মুসলিম শরীফের বর্ণনা। মুহাজির পুরুষদের মাঝে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) সবার শেষে মৃত্যু বরণ করেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস মৃত্যুর সময় একটি উলের জুব্বা বের করে ওসীয়্যত করেন যে, আমার কাফন হিসেবে এটি ব্যবহার কোরো, কেননা আমি এই জুব্বা পরিধান করে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি এটিকে এই সময়ের জন্য অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম।

হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লিখেন,

হযরত উমর (রা.)-এর যুগে যখন সাহাবীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয় তখন বদরী সাহাবীদের সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের জন্য বিশেষ ভাতা নির্ধারণ করা হয়। স্বয়ং বদরী সাহাবীরাও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ গর্ব বোধ করতেন। যেমন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মিওর সাহেবও লিখেন যে,

ইসলামী সমাজে বদরী সাহাবীদের সর্বমহান সদস্য মনে করা হতো। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস যখন ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুপথযাত্রী ছিলেন তখন তিনি বলেন, আমার জন্য সেই জুব্বা নিয়ে আস যা আমি বদরের যুদ্ধের দিন পরিধান করেছিলাম এবং যা আজকের দিনের জন্য আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি। সা'দ (রা.) সেই ব্যক্তি যিনি বদরের যুদ্ধের সময় যুবক ছিলেন। পরবর্তীতে তার হাতে ইরান বিজিত হয়। তিনি কূফার প্রতিষ্ঠাতা এবং ইরাকের গভর্ণর ছিলেন। কিন্তু তার দৃষ্টিতে এই সমস্ত সম্মান ও গৌরব বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সম্মান ও গৌরবের মোকাবিলায় মূল্যহীন ছিল। তিনি নিজের জন্য বদরের যুদ্ধের পোশাককে সমস্ত পোশাক থেকে সবচেয়ে পবিত্র পোশাক বলে মনে করতেন। তার শেষ ইচ্ছা ছিল, এই পোশাকে আবৃত করে তাকে যেন কবরে নামানো হয়।

তিনি সা'দ নামের একটি প্রাসাদ বানিয়েছিলেন। এই মহল নির্মাণে যদি কারো মনে কোন প্রশ্ন জাগে তাহলে এর উত্তর হলো, তিনি শেষ বয়সে নির্জনবাস অবলম্বন করেছিলেন আর যে জিনিস তিনি পছন্দ করেছেন তা হলো, বদরের যুদ্ধে পরিধান করা কাপড়। এছাড়াও পূর্বে বর্ণিত তার নিভৃত জীবনযাপনই তার বিনয় ও সরলতার প্রমাণ।

হযরত সা'দ বলেন, আমি যখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি তখন আমার কেবল মাত্র একটি কন্যা সন্তান ছিল। অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, বিদায় হজ্জের সময়ও তার একটিই কন্যা সন্তান ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি এত কৃপা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমার সন্তানসন্ততির সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। তিনি বিভিন্ন সময়ে মোট নয়টি বিয়ে করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ঘরে তাকে চৌত্রিশটি সন্তান দিয়েছেন যাদের মাঝে সতেরো

জন ছেলে এবং মেয়ে ছিল সতেরো জন। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের স্মৃতিচারণ এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতে পরবর্তী সাহাবীর স্মৃতিচারণ শুরু করব ইনশাআল্লাহ্।

আজ আমি নামাযের পর কয়েক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াব। প্রথম জানাযা হলো জনাব সাফদার আলী গুজ্জর সাহেবের, যিনি ফযল মসজিদে যিয়াফত বিভাগে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছিলেন। তিনি গত ২৫শে জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (মৃত্যুর পূর্বে) কয়েক দিন তিনি হাসপাতালেও ছিলেন। ৭৯ বছর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী করেছিলেন। তিনি ত্রিশ বছর পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের যিয়াফত বিভাগে সেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছেন। তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমান, জামা'তের কর্মচারী এবং অন্যান্য সদস্যদেরও অসাধারণ সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন। এছাড়াও মরহুম দীর্ঘ দিন আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকা এবং আহমদীয়া পত্রিকার প্যাকেজিং ও পোস্টিংয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার অভিবাসন মামলা দীর্ঘ দিন ঝুলে থাকে আর দীর্ঘকাল পর তা গৃহীত হয় এবং তার পরিবারের যুক্তরাজ্যে আসার ব্যবস্থা হয়। তখন তিনি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আর কখনো অভিযোগ করেন নি যে, এতদিন তাকে একাকী জীবন কাটাতে হয়েছে। এ মর্মে তিনি কখনো কোন অভিযোগ করেন নি। খিলাফতের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন এবং খিলাফতের দ্বারেই পড়ে থাকতেন। তিনি খিলাফতের জন্য এতটাই নিবেদিত ছিলেন যে, আমি বলব, তিনি অন্যদের জন্য এক দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি জামা'তের সদস্য এবং রক্তসম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ সম্মানজনক সম্পর্ক রাখতেন। দোয়ায় অভ্যস্ত, নিয়মিত নামাযী, উত্তম সেবক, সর্বজনপ্রিয় এবং খুবই কোমল প্রকৃতির অধিকারী মানুষ ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবী ভাষার কবিও ছিলেন আর তার সুমধুর কণ্ঠের জন্য তিনি জামা'তের সদস্যদের মাঝে জনপ্রিয় ছিলেন। জলসা সালানার সময় সাধারণের মাঝে নযম পড়ার কারণে মরহুমকে অনেক পছন্দ করা হতো। মরহুম লাহোরের প্রসিদ্ধ জামা'ত হান্ডু গুজ্জর-এর সদস্য ছিলেন। তিনি তার স্ত্রী ছাড়া ৪ পুত্র ও ২ কন্যা স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রেখে গেছেন।

জনাব আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব লিখেন, সফদর আলী সাহেব অত্যন্ত সরল প্রকৃতির একজন মানুষ ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন জামা'তের একজন নিষ্ঠাবান ও নিঃস্বার্থ এবং অক্লান্ত কর্মী। তিনি বলেন, তার তিনটি অসাধারণ গুণ ছিল যা আমার হৃদয়ে তার জন্য ভালোবাসা বৃদ্ধি করেছে। প্রথমত তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ ছিলেন। সীমিত জীবনোপকরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি কথায় কথায় আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। দ্বিতীয়ত তার হৃদয়ে যুগ-খলীফা ও খিলাফতের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। তিনি বলেন, সাক্ষাৎ সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে তিনি খিলাফতের সাথে আন্তরিক সম্পর্কের কথা বলেন নি, এমনটি আমার মনে পড়ে না। তৃতীয়ত তিনি ধর্মের সেবা আন্তরিক ভালোবাসার সাথে করতেন আর এটিকে তিনি সৌভাগ্য বলে মনে করতেন।

তার কন্যা তাহসিন সাহেবা লিখেন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি অন্যদের সুখ দিয়েছেন। তার কোন পরিচিত মানুষ কিংবা মসজিদে কাউকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখলে বাড়িতে এসে তিনি নাম উল্লেখ করে আমাদের সবাইকে দোয়া করতে বলতেন। সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহ্ তালার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। অন্যদের উপকার করে তাদের প্রতিই এই বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন যে, আপনি আমাকে পুণ্যকর্ম করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, তিনি বলতেন, তোমরা দুই বোন এ কারণেও আমার খুব প্রিয় যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কন্যাদের সম্মান করবে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। পুনরায় তিনি বলেন, আমাদেরকে তিনি পরম স্নেহ-মমতার পাশাপাশি অনেক সম্মান ও মর্যাদাও দিয়েছেন।

দ্বিতীয় কন্যা রাযিয়া সাহেবা লিখেন, আমাদের পিতা সর্বদা আমাদেরকে খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখার নসীহত করতেন। তিনি নিজেও খিলাফতের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি লিখেন, তার মৃত্যুতে সহমর্মিতা জানানোর জন্য যারাই এসেছেন, তাদের প্রত্যেকেই বলেছেন, আমাদের মনে হতো তিনি আমাদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। আসলে প্রত্যেকের সাথেই তার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমাদের ধারণা ছিল তিনি হয়ত মসজিদের আশেপাশের লোকজনের সাথেই সুসম্পর্ক রাখতেন, কিন্তু (তার মৃত্যুর পর) সকলেই বলছিল, তিনি যেন আমাদের পরিবারেরই একজন সদস্য ছিলেন। দূর দূরান্তের লোকদের কাজ করে দিতেন আর তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। তার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও সেবা প্রদানের ফলেই এমনটি অর্থাৎ লোকজন এভাবে তার সম্পর্কে নিজেদের আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করেছে। মানুষ আমার কাছেও তার সম্পর্কে অনেক চিঠি লিখেছে আর প্রতিটি পত্র থেকেই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেকের সাথেই তার ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক ছিল। খুব কম মানুষই এমন হয়ে থাকেন যিনি সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে সর্বজনপ্রিয় এবং সকল শ্রেণির মানুষের সাথে তার সুসম্পর্ক থাকে। একইভাবে প্রত্যেক পত্র লেখকই লিখেছেন, তার প্রতিটি কথাবার্তার কেন্দ্র হতো খিলাফত এবং এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে নিজ প্রিয়দের মাঝে স্থান দিন এবং তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্যকর্ম ও দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। তার সহধর্মিণীকে তিনি স্বাস্থ্য দিন এবং ধৈর্য ও মানসিক প্রশান্তি দান করুন। তার সহধর্মিণীও দীর্ঘকাল অসুস্থ ছিলেন। নিজের শত ব্যস্ততা ও কাজ থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে তিনি তার সেবা করেছেন। অতিথিশালায় তিনি কাজ করেছেন আর তার মাঝে একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর চেয়েও অধিক সেবা করার স্পৃহা ছিল। কিন্তু পাশাপাশি তিনি পারিবারিক দায়িত্বাবলীও সঠিকভাবে পালন করতেন। অনুরূপভাবে ভাষা না জানা সত্ত্বেও ইংরেজ প্রতিবেশীদের সেবা করতেন এবং তাদের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। আর তারাও তার অনেক প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী জানাযা শ্রদ্ধেয়া ইফ্‌ফাত নাসির সাহেবার। তিনি জনাব প্রফেসর নাসির আহমদ খান সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি গত ০৩ মে তারিখে ৯০ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৫১ সনে মরহুম প্রফেসর ডাক্তার নাসির আহমদ খান সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। তিনি তার পেছনে এক কন্যা আয়েশা নাসির সাহেবাকে রেখে গেছেন। তিনি আমেরিকা প্রবাসী ডাক্তার এনায়েতুল্লাহ্ মাঙ্গলা সাহেবের স্ত্রী। পুত্রদের মাঝে রয়েছেন জহির আহমদ খান এবং ডাক্তার মুনির আহমদ খান সাহেব। তার উভয় পুত্রের বিয়ে হয়েছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশে। তার এক পৌত্র নাসীর আহমদ খান সাহেব ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী আর এখন এমটিএ-এর সম্প্রচার বিভাগে সুচারুরূপে নিজ দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি এখানে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের পর ওয়াক্‌ফ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও তার দোয়ার ভাগীদার করুন।

তার পুত্র লিখেন, ছেলেবেলায় আমি আমার আম্মার সাথেই ঘুমাতাম আর অধিকাংশ রাতেই ঘুম ভেঙে গেলে তাহাজ্জুদ নামাযে তাকে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে দেখতাম। একই কথা তার কন্যাও লিখেছেন। তিনি নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর আমরা যারা শিশু ছিলাম তাদের জন্যও সকালে কুরআন তিলাওয়াত করে স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল, এছাড়া যাওয়ার অনুমিত ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে ষাটের দশকে তিনি লাহোরে বসবাস করতেন। সেখানে মডেল টাউনে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভগ্য পেয়েছেন। ২৮ বছর পর্যন্ত তিনি পশ্চিম দারুন্ নসর হালকার লাজনা

ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তখন সুযোগ সুবিধাও অনেক কম ছিল এবং পাড়াটি ছিল বিস্তৃত, কোন বাহন ছিল না। দারুন্ নসর পড়াটি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আর সেই দীর্ঘপথ তিনি পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন জামা'তের সদস্যদেরকে তাদের সকল অ-আহমদী আত্মীয়স্বজন এবং দুর্বল আহমদীদের নিকট পত্র প্রেরণের আহ্বান জানান তখন তিনিও এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার আত্মীয়স্বজনের নিকট অসংখ্য পত্র লিখেন। দরিদ্র আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীদের তিনি কোন না কোন সুযোগে অনেক সাহায্য করতেন। বিশেষ করে রমজান মাসে তিনি অবশ্যই কিছু না কিছু রান্না করে পাঠিয়ে দিতেন। সর্বদা মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি করে বিভেদ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। তার মেয়ে আয়েশা সাহেবা লিখেন, তিনি একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর সাথে নিতান্ত হাস্যবদনে জীবন অতিবাহিত করেছেন। আমাদের শিক্ষাদীক্ষাকে তিনি তার প্রধান দায়িত্ব জ্ঞান করতেন আর একই সাথে অনেক বেশি দোয়াও করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও মাগফিরাত করুন এবং তার সন্তানসন্ততি ও বংশধরদের তার সদিচ্ছগুলো পূর্ণকারী ও তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো জনাব আব্দুর রহীম সাকী সাহেবের। তিনি যুক্তরাজ্য জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী অফিসের একজন কর্মী ছিলেন। গত ৩১ মার্চ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তিনি ১৯৩৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ভারতের নাভা রাজ্যের অন্তর্গত রায়পুর মৌজায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম ছিল রহমত আলী সাহেব। তার মরহুম পিতার বড় চাচা গ্রামপ্রধান চৌধুরী করীম বখ্‌শ সাহেবের মাধ্যমে তার বংশে আহমদীয়াতের আগমন ঘটে। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। মরহুম আব্দুর রহীম সাকী সাহেবের পিতার খালাতো ও চাচাতো বোন এবং মৌলভী কুদরত উল্লাহ্ সানৌরি সাহেবের স্ত্রী মহিলা সাহাবী রহীমন বিবি সাহেবা সম্পর্কে তার ফুফু ছিলেন। মরহুম সাকী সাহেব ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত দশ বছর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তাখ্‌ত হাজারার সেক্রেটারী মাল এবং কায়েদ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। দেশ বিভাগের পর তিনি তাখ্‌ত হাজারায় এসে বসবাস শুরু করেন। এরপর ১৯৬৮ সালে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তাখ্‌ত হাজারার আমীর নিযুক্ত হন এবং ১৯৭৪ সালের জুলাই পর্যন্ত তিনি উক্ত জামা'তের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৭৪ সালের ১৩ জুলাই তারিখে তাখ্‌ত হাজারা'র অ-আহমদী দুষ্ট চক্র আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দুর্বৃত্ত এবং আহমদী বিরোধীদের সমন্বয়ে অনেক বড় সশস্ত্র দল গঠন করে আহমদীদের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যের সূচনা করে। মসজিদের একটি অংশে আগুন লাগিয়ে তা দখল করে নেয়। অতিথিশালা সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে দেয়। সাকী সাহেবের মুদি দোকান ছিল, সেটি লুট করে তাতেও অগ্নিসংযোগ করে। অনুরূপভাবে তার আরো একটি কাপড়ের দোকান ছিল, সেটিও দখল করে নেয়। বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে। তিনি তখন ভিতরেই ছিলেন আর ধোঁয়ার কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। দুর্বৃত্তরা তাকে অচেতন অবস্থায় উঠিয়ে মসজিদে নিয়ে যায় আর লাউডস্পিকারে ঘোষণা করে যে, আমি অর্থাৎ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর তওবা করেছেন যেন অন্য আহমদীরাও জামা'ত ছেড়ে দেয়। যাহোক তার জ্ঞান ফিরলে তিনি দেখেন, বল্লম ও বর্শার বেষ্টনির মাঝে তিনি বসে আছেন আর তার মনমস্তিষ্কে এর গভীর প্রভাব পড়ে। অতঃপর এজন্য তার সন্তানরাই তাকে সেখান থেকে লাহোরে তার কোন আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে তার চিকিৎসা হয় এবং তিনি সেখানেই থাকেন। এরপর লাহোরেই একটি জামা'তে, অর্থাৎ যেখানে গিয়ে দ্বিতীয়বার বসবাস আরম্ভ করেন সেখানেই তিনি পুনরায় ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ করেন। তার এক আত্মীয়ের বাড়িসংলগ্ন জায়গায় নামায সেন্টার নির্মাণ করেন এবং বাজামা'ত নামাযের

প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি শত শত শিশু এবং বড়দের পবিত্র কুরআন পড়িয়েছেন।

অতঃপর ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে হিজরত করে লন্ডনে চলে আসেন। এখানে এসে ২০২০ সন পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী অফিসে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে রীতিমত সেবা করতে থাকেন। তিনি ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীদের চেয়েও অধিক সময়নিষ্ঠ ছিলেন। সবার আগে অফিসে আসতেন যেন কাউকে অপেক্ষা করতে না হয়। বরং কখনো কখনো অফিসে আসার পূর্বে নাস্তা বানাতে দেরি হলে নাস্তা না করেই চলে আসতেন। তার আরেকটি গুণ হলো, তার সন্তানরা লিখেছে যে, প্রত্যহ তিনি পবিত্র কুরআনের ৩ পারা তিলাওয়াত করতেন। খিলাফতের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসা পোষণ করতেন। শিশু ও বড়দেরকে সর্বদা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার এবং যুগ খলীফার সম্মান ও পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে আনুগত্য করার প্রতি পূর্ণ সহমর্মিতার সাথে নসীহত করতেন। ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী, বিশেষত মুরব্বীদের আন্তরিকভাবে সম্মান করতেন এবং তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী এক ব্যক্তি ছিলেন। প্রায় ৬০ বছরের অধিক সময় তিনি স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ধর্মসেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তার ছেলে খালেদ মাহমুদ সাহেব কলিয়ার্স উড জামা'তের প্রেসিডেন্টও বটে। মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া দুই পুত্র এবং পাঁচ কন্যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততি এবং বংশধরদেরও তার পুণ্য বাসনাগুলো পূর্ণ করার তৌফীক দান করুন।

পরবর্তী জানাযা যেটি পড়াব সেটি হলো সাঈদ আহমদ সেগাল সাহেবের জানাযা। তিনি আমাদের পিএস দপ্তরে ডাকপ্রেরণ বিভাগে স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন। গত ১২ এপ্রিল তারিখে ৯০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে ২ পুত্র এবং ২ কন্যা রেখে গেছেন। মরহুমের শৈশব কাটে কাদিয়ানে আর প্রথমিক শিক্ষাও তিনি সেখানেই অর্জন করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ এখানে প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তরের ডাকপ্রেরণ বিভাগে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত এবং জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। জাগতিক জ্ঞানের পাশাপাশি পবিত্র কুরআন এবং জামা'তী মাসলা মাসায়েল সংক্রান্ত গভীর জ্ঞান রাখতেন। নামাযে নিয়মিত এবং খিলাফতের প্রেমিক ছিলেন। খুবই বিনয়ী এবং ভদ্রতার এক উত্তম দৃষ্টান্ত ছিলেন। বন্ধুমহলে খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমিও দেখেছি, যখনই সাক্ষাৎ করতেন পরম বিনয় ও বেদনার সাথে ইচ্ছা ব্যক্ত করতেন যেন তার সন্তানরাও একইভাবে জামা'তের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে। আসলাম খালেদ সাহেব লিখেন, তিনি বিশেষ জ্ঞানপিপাসু প্রকৃতি রাখতেন। প্রায়শই দুপুরের খাবারের সময় বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ আলোচনা করতেন। বিশেষত খ্রিষ্টধর্ম ও ইহুদি ধর্মমতের গভীর জ্ঞান ছিল তার। আমাদের দপ্তরের কর্মী বশীর সাহেব লিখেন, শেষ বয়সেও তিনি জামা'তের সেবা করার পূর্ণ চেষ্টা করতেন। তিনি বলেন, একবার কোন কাজে মসজিদে আসার সময় মাথা ঘুরে নীচে পড়ে যান এবং আঘাতও পান, কিন্তু তা সত্ত্বেও (বেশ দূর থেকে পায়ে হেঁটে আসতে হতো) দপ্তরে অবশ্যই আসতেন যেন সেবা করার সুযোগ হাতছাড়া না হয়। নিজের বড় বাড়ি বিক্রি করে মসজিদের কাছে ফ্ল্যাট কিনে নিয়েছিলেন যেন যাতায়াতের সুবিধা হয়।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি মাগফিরাত ও কৃপা করুন এবং তার সন্তানদের পক্ষে তার দোয়া সমূহ কবুল করুন। (আমীন)